অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। শিক্ষা রে -তোর কী হবে?।।

কিছুদিন আগে (২.২.১৭) দেশের সংবাদপত্রে চোখ বুলাতে গিয়ে প্রথম আলোর একটি সংবাদ শিরোণামে চোখটা থমকে গেলো। শিরোণামটি হলো -' পরীক্ষায় মূল্যায়ন সমানভাবে করার উদ্যোগ শিক্ষামন্ত্রীর " আগ্রহভরে সংবাদটি পড়ে যা বুঝলাম তা হলো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তরপত্র যেন সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়, তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, একই ধরনের উত্তরপত্রে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে নম্বর পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুই হাজার প্রধান পরীক্ষককে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বাকি পরীক্ষকদের এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলবেন।

সংবাদটা পড়ে একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার চেষ্টা করছিলাম যে শিক্ষার্থীরা এবার থেকে সবাই সমমানের নাম্বার পাবে পরীক্ষায়। পরক্ষণে মনে হলো তা' হলে কী এতোকাল সবাই উল্টা পাল্টা নাম্বার পেয়ে আসছিলো? বা পরীক্ষকরা কী তবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নাম্বার দিয়ে আসছিলেন? তা'হলে বাংলা লিঙ্ক দরে যে শিক্ষার্থীরা জিপিএ-৫ পেয়ে আসছিলো সেটাই কী তার কারণ? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আর কত এক্সপেরিমেন্টেশন চালাবেন? তাঁর এই এক্সপেরিমেন্টেশনের যে শেষ কোথায় তা বোধ করি তিনি নিজেও ঠাহর করতে পারছেন না। ক'দিন আগে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারী শিক্ষামন্ত্রী ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর আরো অনেক দেশে শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বই বিতরণ করা হয় তবে সেখানে ঢাকঢোল টিভি ক্যামেরার বাহুল্যতা থাকে না।

ভাল কথা তিনি বই দিলেন। কিন্তু বিনামূল্যের বইয়ের ভিতরে কী দিলেন তা তো দেখলেন না। ইতিহাসবিদ লেখক প্রফেসর মুনতাসীর মামুনের ভাষায় শিক্ষাকে যে "হিজাবীকরন করা হলো তা মন্ত্রী বুঝলেন না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করলেন। অক্ষর পরিচয়ে লেখা হলো 'ও' তে ওড়না - ওড়না পরতে চাই, অ-তে অজু এসো অজু করি ভাই। মুসলমান হিন্দু খ্রীস্টান বৌদ্ধ ছেলে এবং মেয়ে সব বাচ্চাকেই এগুলো পড়তে হবে। এই হিজাবীকরণ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বইছে যদিও প্রধান নির্বাচন কমিশন গঠনের ডামাডোলে তা অনেকটা ধামাচাপা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো কেন এমন হচ্ছে। স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী একটা সরকার যখন ক্ষমতায় তখন কেন এ বেহাল অবস্থা। কেন উল্টা পথে হাঁটছে শিক্ষা?

মনে পড়লো ১৯৮৯-র জানুয়ারীতে চরমপত্রখ্যাত এম আর আখতার মুকুল এবং তাঁর স্ত্রী ড. মাহমুদা খানম রেবা একাত্তরের বর্ণমালা নামে বাচ্চাদের জন্য ছবিসমেত একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ছোটবেলা থেকেই কোমলমতি শিশুদের বর্ণমালা চেনাবার সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের সাথে কিঞ্চিত পরিচয় করিয়ে দেয়া। তাঁদের বইটাতে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস টেনে আনেননি তাঁরা তবে কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে স্বাধীনতার কথা টেনে এনেছেন। যেমন অ-তে অপরূপ সব ফুলের ডালি, আ-তে আমরা সবাই জাত বাঙালি। উ-তে উট পাখি উড়ে না, ঊ-তে ঊনসত্তর ভুলবো না। আবার ও-তে ওসমানীর নাম কে না জানে, ঔ-তে ঔষধ নীতি সবাই মানে। তেমনি আছে ক-তে কাক ডাকে কা কা, খ-তে খান সেনারা ভেগে যা, গ-তে গণ হত্যার হিসাব নাই, ঘ-তে ঘাতকদের বিচার চাই।

আমি বলতে চাইছি সদিচ্ছা থাকলে এই হিজাবীকরণ থেকে প্রাথমিক পাঠ্যবইটাকে রক্ষা করা যেতো। সমালোচনার মুখে এক সময়ে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে সকল পাঠ্য বইয়ের তৈরীর পেছনে আছে এক বিশাল সিন্ডিকেট। উপরে উপরে যত কিছু করা হোক- তা সে জ্ঞানীগুনি হোক আর বুদ্ধিজীবি হোক যারাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকুক না কেন সিন্ডিকেটের সাথে কেউ পেরে ওঠে না। এই সিন্ডিকেট যা চাপাবে তাই গ্রহণ করতে হবে। এই সিন্ডিকেটের সাথে

সরাসরি জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রকাশক, আমলা, পুস্তক ব্যবসায়ী সবাই। সিন্ডিকেটকে ডিঙ্গিয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ একেবারে অসম্ভব। একটা উদহারণ দিয়ে বলি। ধরুন আপনি সিন্ডিকেটকে এড়িয়ে বই প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন দেখবেন কোন প্রকাশক তা প্রকাশ করতে চাইবে না। যদিও তা প্রকাশ করলেন কোনভাবে কোন ডিস্ট্রিবিউটার তা ধরবে না। কোন পুস্তক ব্যবসায়ী তা নেবে না। শিক্ষামন্ত্রী এসব মারপ্যাঁচ যদিও বুঝছেন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমার নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৮৯-৯০-র কথা। আমি তখন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটে একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। আমাদের ইনষ্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান তখন ড. আজীজুল ইসলাম (পরবর্তীতে তিনি মহাপরিচালক হলেন)। একদিন তিনি তাঁর ঘরে আমাকে, ড. ফরহাদ জামিল এবং ড. নজরুল ইসলামকে ডাকলেন। বললেন ঢাকা বোর্ড থেকে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটা নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা হবে যাতে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের সাথে কৃষিকেও অন্তর্ভূক্ত করা হবে যা সব ছাত্রছাত্রীকেই পড়তে হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন কৃষির অংশটা তৈরী করে দিতে। আপনারা তিন জনই কমবেশী লেখালেখি করেন ভাল পড়ান তাই আমি এ দায়িত্বটা আপনাদের দিতে চাই। বইয়ে আপনাদের নাম থাকবে এবং এ কাজের জন্য আপনারা ভাল পারিশ্রমিক পাবেন। আমরা তিনজন বই লেখায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম খানিকটা উৎফুল্ল হলাম বৈকি। তো একদিন আমাদের কাজ শেষ হলো। আজীজুল ইসলাম স্যারকে সব লেখা জমা দিলাম। তিনি তা নিয়ে গেলেন বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে। কয়েকদিন পরে স্যার জানালেন আমাদের কাজ চেয়ারম্যানের খুব পছন্দ হয়েছে। আমরা উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষায় আছি কবে ছাপার অক্ষরে বইটা দেখতে পাবো। মাঝে কয়েক মাস পেরিয়ে গেছে। তো একদিন স্যার আমাদের তিনজনকে ডাকলেন। আমাদের তিনজনকে দশ হাজার টাকা করে একেকটি ব্যাংক চেক দিলেন। কিন্তু স্যার খুব গম্ভীর খুব একটা কথা বলছেন না। অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন। বললেন এই চেক আপনাদের পারিশ্রমিক তবে দুঃসংবাদ হলো আপনাদের লেখা অংশটি ছাপা হচ্ছে না। কারণ বোর্ডের বই লেখার কয়েকটি সিন্ডিকেট আছে এদের বাইরে কেউ বই লিখে সুবিধা করতে পারেনি। বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব সেই প্রথাকে ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন পারলেন না।

প্রশ্ন হলো আর কতকাল আমাদের শিক্ষা এই সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামিদামি শিক্ষকরাও এই সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত। সিন্ডিকেট মানেই যে এরা কেবল বাজে বইপ্রকাশ করেন তা নয় তাঁদের অনেক ভাল ভাল বইও আছে তবে ব্যবসাটা তাঁদের একচেটিয়া। ওরাই নির্ধারণ করেন কে কী লিখবেন। জামায়াতী লেখক না হেফাজতী লেখক না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লেখক, না মুক্তমনা লেখক না প্রগতিশীল লেখক।

যেই লিখুক সে বই পড়েই কিন্তু তৈরী হবে আগামী দিনের নাগরিক। আগামী দিনের কর্ণধার। তাই অনেক বুদ্ধিজীবি এখন প্রশ্ন রাখেন আমরা কী তবে নতুন করে জঙ্গী প্রশিক্ষণের প্রজেক্ট নিয়েছি বা জঙ্গী প্রশিক্ষনের সুযোগ ইনডাইরেক্টলী কারো হাতে তুলে দিচ্ছি? সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমরা আর কোন ভুল এফোর্ড করতে পারবো না। শিক্ষা ব্যবস্থা আর প্রশাসন সব সমান্তরাল ভাবে চলতে হবে। ভুল হলে আর গোঁজামিল হলে কিন্তু সেই সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গার কাহিনীর মত অবস্থা দাঁড়াবে।

শিক্ষা মন্ত্রী বৃহস্পতিবার (২.২.১৭) রাজধানীর ধানমন্ডি গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলকেন্দ্রে পরীক্ষা দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের সহায়তায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যে একই ধরনের উত্তরপত্রে একেক পরীক্ষক একেক রকম নম্বর দেন। এটি যাতে না হয়, সে জন্যই এমন ব্যবস্থা। তিনি আরও বলেন, ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে। কোনো সমস্যা নেই। মন্ত্রী বলেন, আগে তাঁরা দলবল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা এড়াতে গত তিন বছর ধরে সংশ্লিষ্ট দু-একজনকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছেন। এবারও তাই করেছেন।

প্রশ্নটা হলো শিক্ষমন্ত্রীকে কেন দু'একজন লোক নিয়ে পরীক্ষার হলের ভেতরে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ঢুকতে হবে যেখানে সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তাঁরা তো বাইরে থেকেই সব খোঁজ খবর করতে

পারেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। আরেকটা বিষয় সব পরীক্ষা তা সেই প্রাথমিক থেকে শুরু করে এস এস সি এইচ এসসি আলেম ফাজিল সব পরীক্ষার রেজাল্ট কেন প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। পৃথিবীর কোথাও দেখিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর অফিসে বসে স্কুল কলেজের রেজাল্ট দিচ্ছেন তাঁর মন্ত্রী সভাসদদের নিয়ে যা আমরা প্রতিবছর টিভিতে দেখি। এ প্রথার অবসান চাই অচিরেই।

এবার সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গার গল্পটা। এ গল্প সবার জানা। তবু এ আলোচনার সাথে যায় বলে আবারও লিখছি। আশা করছি গল্পটা জানা থাকলে কেউ বিরক্ত হবেন না। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের গল্প এটি। একজন স্কুল ইনস্পেক্টর গ্রামের এক স্কুল পরিদর্শনে গেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি এক ক্লাসরুমে চুপিসারে ঢুকে পড়েন। দেখলেন ক্লাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। গজনীর বীর সুলতান মাহমুদ যিনি ১৭বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং তাঁর ১৬তম আক্রমণের সময়ে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন। গজনীর বীর সুলতান মাহমুদের সেই ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণের ইতিহাস আলোচনা হচ্ছে ক্লাসে। এর মধ্যে ইনস্পেক্টর ক্লাসের একজন ছাত্রকে ইঙ্গিত করে বললেন - বলতো বাবা সোমনাথের মন্দির কে ভেঙ্গেছিলো? ছাত্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাতর কণ্ঠে বললো স্যার আমি ভাঙ্গি নাই। ইনস্পেক্টর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন না না এটা তো তোমার ভাঙ্গার কথা নয়। আমি ইতিহাসের কথা বলছি। বেশ দেখি তো কে বলতে পারে সোমনাথের মন্দির কে ভেঙ্গেছিল? সবাই চুপ। কেউ কোন কথা বলছে না। এবার ক্লাসের শিক্ষক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন স্যার সত্যি বলতে আমাদের স্কুলের ছেলেরা এতো ভাল যে মন্দির ভাঙ্গা তো দূরের কথা কারো ক্ষেতের ফুটিটাও তুলে খায় না। ইনস্পেক্টর লা জবাব। চলে এলেন হেড মাষ্টারের কক্ষে। ইতিবৃত্ত সব বললেন। হেড মাষ্টার জোর দিয়ে বললেন হলপ করে বলতে পারি স্যার আমার স্কুলের ছেলেমেয়েরা কোন ভাঙ্গাভাঙ্গির মধ্যে নাই। ইনস্পেক্টর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে ঢাকায় ফিরে এলেন। এসে শিক্ষা অধিদপ্তরে বিশাল এক রিপোর্ট পাঠালেন। রিপোর্টের প্রথমেই বিষয়ের স্থানে লেখা ছিলো স্কুল পরিদর্শন এবং সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গা প্রসঙ্গে। শিক্ষা অধিদপ্তর পুরো রিপোর্টটা না পড়ে শুধু বিষয়টা পড়ে বললো মন্দির ভেঙ্গেছে তো এ ফাইল এখানে কেন? এ ফাইলতো যাবে ইমারত বিভাগে। ইমারত বিভাগ বিষয় পড়ে বললো মন্দির ভেঙেছে ফাইল যাবে ধর্ম মন্ত্রনালয়ে। ধর্ম মন্ত্রনালয় বললো মন্দির ভাঙ্গাভাঙ্গি বড় সেনসিটিভ ইস্যু ফাইলটা বরং রাষ্ট্রপতির দপ্তরে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হোক। রাষ্ট্রপতির সচিব নোট দিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন অনেক মসজিদ মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অতএব সোমনাথের মন্দির মেরামতের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদানের জন্য সুপারিশ করা গেল।